মোমের মিউজিয়াম

অদ্রীশ বর্ধন

মোমের মিউজিয়াম

অদ্রীশ বর্ধন

অলংকরণ: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (চিত্রচোর)

নি ছক কৌতূহলের বশেই করঞ্জাক্ষের মিউজিয়ামে এসেছিল শান্তনু। কার মুখে ও শুনেছিল, করঞ্জাক্ষের এই বিচিত্র সংগ্রহশালায় মোমের তৈরি যেসব বস্তু আছে, তার তুলনা নাকি সচরাচর দেখা যায় না। কল্পনার বিভীষিকা শিল্পীর হাতে যে কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে—করঞ্জাক্ষের মিউজিয়ামই তার নিদর্শন।

তাই শান্তনু এসেছিল গুজবের মধ্যে মিথ্যার পরিমাণ কতটা তা যাচাই করে নিতে। কিন্তু সমস্ত মিউজিয়ামটা দেখার পর মত পালটাতে বাধ্য হল সে। করঞ্জাক্ষের কল্পনা, তার শিল্পনৈপুণ্য, রুচিবৈচিত্রের বাহাদুরি আছে বটে। দেশবিদেশের হরেকরকম মূর্তি ছাড়াও আছে ভারতীয় রূপকথা-পুরাণাদির অসম্ভব কল্পনার প্রায় সজীব রূপায়ণ। আছে চিন-জাপানের উপকথার ড্রাগন—কনফিউশিয়াস, পেটমোটা দানো। আছে লন্ড্রু, ডক্টর ক্রিপেন, ম্যাডাম ডেমার্স। রাবণের দশমাথা, কুম্ভকর্ণের বিশাল মূর্তি। বকাসুরের বীভৎস মাথার পাশে আছে জলকন্যার মিষ্টি মূর্তি—ঠোঁটের কোণে তাদের নিঠুর হাসি। এসব ছাড়াও যা ছিল—তা দেখে আপনা হতেই দ্রুত হয়ে এল শান্তনুর শ্বাসপ্রশ্বাস। এইসব ভয়াল সুন্দর সৃষ্টির পেছনে যে মানুষটি—সে যে সাধারণ দরের শিল্পী নয়, তা উপলব্ধি করল সে। প্রতিভা যে এরকম বিকৃত অথচ এত নিখুঁত হয়,তা জানবার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য এর আগে শান্তনুর হয়নি।

মোম দিয়ে পুতুল গড়ার শিল্প করঞ্জাক্ষ শিখেছিল পাশ্চাত্যে। কর্মজীবন শুরু হয় বোম্বাইতে। নামকরা কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল সে। কিন্তু দাসত্বশৃঙ্খল তার বেশি দিন সহ্য হল না,তাই ফিরে এল বাংলাদেশে। কিন্তু নানা লোকে নানা কথা বলে। তার উন্মাদ শিল্পপ্রতিভা নাকি সন্দেহ জাগিয়েছিল কর্তৃপক্ষদের মনে; এ ছাড়াও গোপনে তন্ত্রমন্ত্রের অভ্যাস নাকি ছিল করঞ্জাক্ষের। অবশ্য তার মোমের মিউজিয়ামের সুনাম ছড়িয়ে পড়ার পর ইদানীং সমালোচকদের শব্দগুলো অনেক মোলায়েম হয়ে এসেছিল। Teratology অর্থাৎ

বিকলাঙ্গ জন্তুজানোয়ারের অনুশীলন আর দুঃস্বপ্ন জাগানো মূর্তিবিজ্ঞান ছিল তার শখ। বুদ্ধি করে অবশ্য বিশেষ কয়েকটি ভয়াবহ মূর্তি সে লুকিয়ে রেখেছিল কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিশেষ একটি চেম্বারে। এই চেম্বার দেখেই রোমাঞ্চিত হয়েছিল শান্তনু। উন্মাদ কল্পনার অভিব্যক্তি বিকট নিদর্শনগুলো শুধু অসম্ভব রূপকথাতেই সম্ভব—জীবন্ত রঙে রাঙানো সেসব ভীষণ সুন্দর সৃষ্টি দেখলে দুর্বল লোকের স্নায়ুবিপর্যয় ঘটা আশ্চর্য নয় মোটেই।।

কতকগুলি মূর্তির নব বর্ণনা উপকথাতেই পড়েছে শান্তনু। স্টিনো,য়ুরিয়েলি আর মেদুশা—তিন ভয়ংকর মূর্তির পৌরাণিক রুদ্রাণী—যাদের দেখলেই মানুষ পাথর হয়ে যেত। গলগল করে আগুন-বমি করা কিমিরা। অগ্নিনিঃশ্বাস আর রক্তজিহ্বা ড্রাগন। একচক্ষু সাইক্লোপ। শূর্পনখা আর তারকাসুর। নাগরাজ আর দেবী মনসা। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা—এই দশ মহাবিদ্যা। তা ছাড়া আছে দশাবতারের আশ্চর্য রূপায়ন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন,পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ আর কল্কি—ভগবানের এই দশটি অবতারের মূর্তি হঠাৎ দেখলে জীবন্ত মনে হয়। এসব মূর্তির বর্ণনা তো শান্তনুর পড়া,কিন্তু এরপর যা দেখল,তা সে কোন দিন কল্পনাই করতে পারেনি। দেশ ও বিদেশের কত পুঁথি ঘেঁটে যে এইসব বীভৎস কল্পনার সৃষ্টি তা ভাবতেও অবাক লাগে। কোটি কোটি বছর আগে যেসব বিভীষিকা পৃথিবীর জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে স্থান পেয়েছিল,তা ও শিল্পীর চোখে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন কোণ থেকে হরেকরকম কায়দায় আলো ফেলার গুণে ভয়ংকর সুন্দর মূর্তিগুলোর ভয়াবহতা যেন আরও ফুটে বেরিয়েছে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সুস্থ মানুষেরও গা শিরশির করতে থাকে, মাথা ঘুরে ওঠে।

করঞ্জাক্ষের কারখানা আর অফিসঘরটা কিন্তু মাটির ওপরে নয়—নিচে। মস্ত একটা পাথরে বাঁধানো চত্বরের সমান্তরালে কারখানায় ছাদ। আগাছাভরা অনেক দিনের পুরানো প্রাসাদের পেছনের অংশ এদিকটা। ধুলো-পড়া শার্শি দিয়ে তাই যতটুকু আলো চুপিসারে ঢোকে,তাতেই আবছা দেখা যায় ক্ষয়ে যাওয়া ইটের দেওয়াল, মাঝে মাঝে চামচিকে আর মাকড়সার আড্ডা।

মূর্তিগুলো সারানো হয় এইখানেই। কিছু কিছু তৈরি হয়েছে। মোমের হাত-পা-মাথা আর টুকরো টুকরো দেহের অংশ সাজানো ছিল অনেকগুলো বেঞ্চির ওপর। দেওয়ালের গা ঘেঁষে উঁচু তাকে সাজানো কিম্ভূতকিমাকার পরচুলা,ঝকঝকে হিংস্র নকল দাঁতের সারি,আর চকচকে মসৃণ চোখ। হুক থেকে ঝুলছে কত বিচিত্র

রকমের পোশাক। একদিকে রাশি রাশি চামড়ার রঙে রাঙানো মোমের কেক,রঙের কৌটো আর ছোটবড় তুলি। ঘরের ঠিক মাঝখানে মস্ত একটা আগুনের চুল্লি। ঝিঁকের ওপর বসানো বিরাট একটা গামলার মতো পাত্র। মূর্তি গড়ার মোম এইখানেই গলানো হয়। গামলার কিনারায় ছোট্ট একটা খাঁজ—আঙুল ছোঁয়ালেই যার মধ্যে দিয়ে ঝরে পড়ে গলিত তরল মোমের ধারা।

হলঘরের একটা দিক কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা। ভেতরে আরামকেদারা, লেখবার টেবিল-চেয়ার। আর চারদিকে কাচের আলমারিতে থরে থরে সাজানো পুঁথি।

সেসব কেতাবকে পুঁথি ছাড়া আর কোনও আখ্যা দেওয়া যায় না। প্যাপিরাস পাতায় লেখা মিশরীয় পুঁথি থেকে শুরু করে দুষ্প্রাপ্য তিব্বতীয় গ্রন্থ, ভূর্জপত্রে লেখা তন্ত্রমন্ত্রের পুরাণ এবং আরও কত শত জানাঅজানা কেতাবের ভিড় আলমারিগুলোতে। বয়সের ভারে বিরং, বিবর্ণ তাদের শ্রী, তবুও সযত্নে ঝকঝকে তকতকে কাচের বুককেসে থরে থরে সাজানো বইগুলো। এক নজরেই বোঝা যায়, এইসব দুর্লভ তন্ত্রপুরাণ শুধু সাজিয়ে রেখেই খুশি নয় করঞ্জাক্ষ—রীতিমতো পড়াশোনাও করে।

হলঘরের এদিকে-ওদিকে কতকগুলো বিদঘুটে দানবমূর্তি ছড়ানো। কোনওটা শেষ হয়েছে, কোনওটা তুলির শেষ পোঁচের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের শেষ প্রান্তে মোটা মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি মজবুত একটা দরজা। ভারী ভারী লোহার কড়ায় ঝুলছে বড়সড়ো একটা তালা। অতিকায় কুলুপটার ওপরে আঁকা বিচিত্র সাংকেতিক হরফ—যার মাথামুণ্ডু না বুঝতে পারলেও নিতান্ত অকারণেই গা শিরশির করে ওঠে শান্তনুর।

করঞ্জাক্ষ মানুষটাও যেন কীরকম। আশ্চর্যসুন্দর মোমের মিউজিয়ামের উপযুক্ত স্রষ্টাই বটে। যেমন লম্বা, তেমনি রোগা তার চেহারা। চুল উসকোখুশকো। জামাকাপড়ও তেমনি। দুই চোখ কোটরে ঢোকা—কিন্তু হালকা মেঘের মতো পাতলা স্বপ্নের ছায়া সেখানে, অনেক দূর থেকে আকাশের প্রান্তে যখন মেঘ ডাকে,তখন যেমন গুরু গুরু ধ্বনি শোনা যায়,করঞ্জাক্ষ কথা বললে তেমনি মনে হয়—এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর তার স্বর। তার দুই চোখের তন্ময়তা আর ভরাট স্বরের গভীরতা যে কোনও মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে আনে তার কাছে,এমনই প্রখর তার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু পরমুহূর্তেই মানুষটি বুঝতে পারে, কোথায় যেন একটু পাগলামো দানা বেঁধে আছে করঞ্জাক্ষের মধ্যে।

আরও কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর করঞ্জাক্ষ আরও সহজ হয়ে উঠল শান্তনুর কাছে। বন্ধুর মতোই সব কথা খুলে বলত। শুধু পড়াশোনা করেই যে ক্ষান্ত নয় করঞ্জাক্ষ, তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে হাতেকলমে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর অভ্যাস যে তার আছে, তা যখন শান্তনু শুনল, তখন তার হাসি পেয়েছিল। পাছে তার অবিশ্বাস হয়, তাই অনেকগুলো বিদঘুটে ফোটোগ্রাফ এনে দেখিয়েছিল করঞ্জাক্ষ। তাতে মনে মনে কৌতুক বোধ করলেও মুখে কিছু বলেনি শান্তনু। অনর্গল নিজের কথা বলে যেত করঞ্জাক্ষ। অধিকাংশই আবোল-তাবোল বকুনি মনে হলেও শান্তনু লক্ষ করেছিল কথাগুলো অসংলগ্ন নয় মোটেই। তবুও বুদ্ধিমান পণ্ডিতের প্রলাপ বলেই সব কথা উড়িয়ে দিয়ে ছিল সে। করঞ্জাক্ষের তন্ত্রচর্চার কাহিনিও তার মনে বিশেষ রেখাপাত করেনি। কিন্তু তার দেশ-বিদেশে বেড়ানোর গল্প শুনতে ভালো লাগত শান্তনুর। তিব্বতে রহস্যজনক অভিযান, আফ্রিকার গহনে অ্যাডভেঞ্চার, আরব মরুভূমিতে, আমাজন নদীর উপত্যকায়, প্রশান্ত মহাসাগরের অজানা দ্বীপের দুর্গম অঞ্চলের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা শুনতে মন্দ লাগত না তার। করঞ্জাক্ষের দুর্বার কল্পনা যে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে ছায়াপথের অগণিত গ্রহান্তরে যাত্রা করেছে তা-ও শুনেছিল শান্তনু। গ্রহান্তরের অধিবাসীদের উদ্ভট রূপায়ণ হয়েছিল তার মিউজিয়ামে। এসবই শুনে যেত শান্তনু, কোনওদিন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু সে দিন সন্ধ্যায় এক বোতল হুইস্কি খাওয়ার পর যে প্রলাপ শুরু করল করঞ্জাক্ষ তা আর বিনা প্রতিবাদে হজম করা গেল না।

সোজা কথায়, করঞ্জাক্ষের বিশ্বাস, সে নাকি প্রকৃতির মধ্যে এমন সব জিনিস দেখেছে, যা এর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সে শুধু দেখেনি—তার আবিষ্কারের প্রমাণও এনেছে সঙ্গে। দুষ্প্রাপ্য পুঁথির পাতায় সে পেয়েছে এমন সব গোপন জায়গার হদিশ, যেখানে মানুষের কোনওদিন পা পড়েনি, কিন্তু যেখানে কল্পনাতীতকাল আগে থেকে, আদম আর ইভ সৃষ্টির পূর্ব থেকে লুকিয়ে আছে অবর্ণনীয় বিভীষিকা, আতঙ্ক আর নৃশংসতা। কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন শোনার আগে থেকেই নাকি এইসব বিভীষিকা পৃথিবীর গলিত লাভার স্রোতে সহজ হয়ে উঠেছিল। হুইস্কির প্রভাবে যতই আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল করঞ্জাক্ষের চেতনা, ততই বাড়তে লাগল তার উন্মাদ প্রলাপ, আর ততই ফুরিয়ে আসতে লাগল শান্তনুর ধৈর্য। করঞ্জাক্ষ যখন জানাল যে, তার মিউজিয়ামে শুধু বড়দের জন্য আলাদা করে ঘেরা অংশটিতে যে রক্ত- জমানো দানবগুলো আছে, তার সবগুলি নকল নয়, নিছক মোমের পুতুল নয়, তখন আর ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না শান্তনু।

আর, তাইতেই ভাটা পড়ল তাদের বন্ধুত্বের উজানে। এসব আষাঢ়ে গালগল্প যে একেবারেই বিশ্বাস করে না শান্তনু, এ কথা পরিষ্কার হয়ে যেতেই গম্ভীর হয়ে গেল করঞ্জাক্ষ। আর প্রাণ খুলে কথা বলত না সে। অসম্ভব কাহিনি শোনানোও বন্ধ হয়ে গেল। শান্তনু এলে তাকে পরদা-ঘেরা অংশে নিয়ে গিয়ে এমন একটা উদ্ভট মূর্তি তাকে দেখাত যে, যার জটিল শিল্পকর্মের কিছুমাত্র মর্ম কোনওদিন সে বুঝে ওঠেনি। না বুঝলেও মুখে তারিফ করতে কসুর করত না, কিন্তু তাতে আর ভোলবার পাত্র ছিল না করঞ্জাক্ষ।

এর কিছু দিন পরেই ঘটল ঘটনাটা।

মাঘের শেষ। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে মিউজিয়ামের দিকে এসেছিল শান্তনু। ভাবল একটু ঘুরেই যাই ভেতরটা। সারি সারি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তির মধ্যে দিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে করঞ্জাক্ষের আশ্চর্য খেয়ালের কথাই ভাবছিল শান্তনু, এমন সময় একটা কুকুরের করুণ আর্ত চিৎকার ভেসে এল তার কানে।

শুধু মরণ-যাতনায় নয়, যেন নিঃসীম আতঙ্কে জীবনদীপ নিবে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো ককিয়ে কেঁদে উঠছে কুকুরটা। শব্দটা আসছিল করঞ্জাক্ষের কারখানার দিক থেকে। ব্যাপার কী তা জানার জন্যে সেদিকে এগতেই বাধা পেল একজন কর্মচারীর কাছে।

লোকটাকে চেনে শান্তনু। উদ্ভট মূর্তি পরিকল্পনায় করঞ্জাক্ষকে সাহায্য করে সে। চোখে-মুখে মঙ্গোলিয়ান ছাপ—বাঙালি নয় নিশ্চয়। কথাবার্তা আড়ষ্ট। ঠোঁটের কোণে দুর্বোধ্য হাসি ফুটিয়ে তুলে সবিনয়ে বলল যে, করঞ্জাক্ষ তো এখন কারখানায় নেই। তার অবর্তমানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া নিষেধ আছে তার।

‘কিন্তু কুকুরটা কাতরাচ্ছে তো কারখানার মধ্যে থেকেই।’ চটে গিয়ে বলে শান্তনু।

‘আপনার ভুল হয়েছে। কারখানায় কেউ নেই। পেছনের ফাঁকা উঠোনটায় রাস্তার কুকুর-টুকুর এসে থাকতে পারে।’ অদ্ভুত স্বরে জবাব দেয় লোকটা।

শান্তনু কিন্তু ওর কানকে অবিশ্বাস করতে পারল না। তবুও লোকটার অনুমান যাচাই করে নেওয়ার জন্যে আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর একটু ঘুরে গেল পেছনের পাথুরে চত্বরটায়। সন্ধ্যা তখন সবে নামছে।

আনাচ-কানাচে অন্ধকার জমে উঠলেও দেখতে অসুবিধে হল না শান্তনুর। কোনওদিকে কোনও কুকুরের চিহ্ন দেখা গেল না।

পাথুরে জমি থেকে এক হাত উঁচুতে কারখানার ধূলিমলিন জানালা তিনটে পরপর দেখা যাচ্ছিল। দেখেই শান্তনুর মাথায় মতলব আসে। সটান জমির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে রুমাল দিয়ে সাবধানে মুছে ফেলল শার্শির ওপরের ধুলো। কাচ পরিষ্কার হয়ে গেলেও কারখানাঘরের কুচকুচে কালো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কিছুই চোখে পড়ল না ওর। পরের জানলা থেকেও সেই দৃশ্য। তার পরেরটাতে চোখ লাগিয়ে ঘরের মধ্যে খুব আবছা একটা আলোর রেখা দেখতে পেল শান্তনু।

কিন্তু আলোর রেখাটা যেদিক থেকে আসছে, ঘরের সে প্রান্তে তো কোনও স্টোভ বা গ্যাসবাতি নেই। তবে ও কীসের আলো? আরও ভালো করে লক্ষ করতে গিয়ে দেখল, আলোটা আসছে একটা চারকোনা অংশ থেকে।

তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল, দেওয়ালের ওই অংশটিতে সে বহুবার দেখেছে মস্ত কুলুপ-আঁটা মোটা কাঠের দরজাটা। তালার ওপর অদ্ভুত সাংকেতিক হরফের ইঙ্গিত না বুঝেও শিউরে উঠেছিল সে। সেই কুলুপই আজ খুলে গেছে, খুলে গেছে মোটা কাঠের দরজা। ওই আলোই তার সাক্ষী।

আলো জ্বলছে রহস্য-ঘেরা গোপন প্রকোষ্ঠের মধ্যে।

ঘণ্টা দেড়েক লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল শান্তনু। সাংকেতিক লিপি-আঁটা কুলুপ-আঁটা দরজার পেছনে কী আছে, তা কোনও দিন করঞ্জাক্ষ তাকে বলেনি—অত প্রলাপের মধ্যেও এতটুকু আভাস দেয়নি, দরজা খোলা তো দূরের কথা। আর আজ খুলে গেছে সে দ্বার, আলো জ্বলছে ভেতরে এবং কুকুরের বুক-কাঁপানো কাতরানি ভেসে আসছে ভেতর থেকে। কী আছে সেখানে? কীসের এই রহস্য? কেন এত গোপনীয়তা? মনে মনে বেশ উৎসুক হয়ে ওঠে ও। তাই অন্ধকার আরও ঘন হয়ে ওঠার পর আবার এসে পৌঁছায় মিউজিয়ামে। কর্মচারীরা তখন একে একে বিদায় নিচ্ছে। কিন্তনুলাল—পরে শান্তনু জেনেছিল মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের সহকারীটার নাম কিন্তনুলাল, ওকে দেখেই মুচকি হাসল। একে তো লোকটার নামটাই বিদঘুটে (কিন্তনু মানে মাকড়সা), তার ওপর ওই চাপা ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখলে মনে হয় যেন কোনও নিতলপুরীর অতল রহস্যমায়া ডেরা বেঁধে আছে ওর মনের অন্ধকারে।

এবার আর বাধা দিল না কিন্তনুলাল। মিউজিয়াম পেরিয়ে কারখানার দরজায় ধাক্কা দিল শান্তনু। প্রথমে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল করঞ্জাক্ষ। দুই চোখ উদ্‌ভ্রান্ত, যেন অকল্পনীয় ভয়াবহতা এইমাত্র দেখে এসেছে। হাতের আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপছিল। শান্তনুকে দেখে খুব যে খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। যেন একলা থাকতে পারলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। নিষ্প্রাণ অভ্যর্থনা জানিয়ে শান্তনুকে ভেতরে নিয়ে গেল করঞ্জাক্ষ। কথাবার্তা তখনও কেমন খাপছাড়া, যেন কিছুতেই সহজ হয়ে উঠতে পারছে না। বারে বারে ফিরে তাকাচ্ছিল কুলুপ-আঁটা ভারী দরজাটার দিকে, আর মাঝে মাঝে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ ফিরে যাচ্ছিল মেঝের ওপর পড়ে থাকা একটা পুরু চটের ছালার ওপর।

শান্তনু লক্ষ করল, যতবার এই দুটি জিনিসের ওপর চোখ পড়ল করঞ্জাক্ষের, ততবারই আপনা হতে শিউরে উঠে প্রাণপণে সে চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে সংযত করার।

কিন্তু সংযম শেষে ভাঙল। বন্যার মতো আবেগে-উত্তেজনায় খড়কুটোর মতো ভেসে গেল তার সমস্ত প্রচেষ্টা। দুই চোখে উড়ো চাহনি নিয়ে অনর্গল কথা বলে চলল শিল্পী করঞ্জাক্ষ।

'ইন্দোচিনের সেই ধ্বংসস্তূপের কাহিনি তোমার মনে আছে? তাহিকো—তাহিকোদের আস্তানা ছিল সেই ভাঙা শহরে। পাছে তোমার অবিশ্বাস হয়,তাই ফোটো দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তবুও তুমি ভেবেছিলে সে বিকট চেহারাটা আমারই সৃষ্টি—এবং তা মোমের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। মাটির তলায় জলের মধ্যে তার পাকসাট যদি দেখতে তুমি…

'কিন্তু এখন যার কথা বলব, সেটা আরও বড়, আরও বীভৎস। এতদিন তোমায় বলিনি, কেননা আমি আটঘাট বাঁধছিলাম। গাঁজাখুরি গল্প বলে যাতে উড়িয়ে না দিতে পার, তারই বন্দোবস্ত করছিলাম। ফোটোগ্রাফগুলো দেখলে বুঝবে, শুধু মোম দিয়ে এ জিনিস হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়।'

আবার তালা আঁটা দরজাটার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল করঞ্জাক্ষ।

‘কোন কেতাব থেকে পথের নিশানা পেয়েছিলাম, তা তোমায় বলব না। সাংকেতিক লিপিগুলোর জটিলতা একবার সরল হয়ে আসতে কিছুই আর বুঝতে বাকি রইল না আমার। উত্তর মেরুর ভেতরে লোমারদের দেশ পেরিয়ে যে দেশ, অনেক, অনেক বছর আগে, মানুষ বলে কোনও জীব পৃথিবীতে আসার আগে, সেই বিজন দেশে আস্তানা ছিল যাদের এ তাদেরই একজন। লোকচক্ষুর আড়ালে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে গেলেও আমি দমলাম না। শুরু হল আমার অভিযান। প্রথমে আলাস্কা পৌঁছালাম, সেখান থেকে ফোর্ট মর্টন হয়ে নুটাক। ব্যর্থ হল না এত কষ্ট—দেখলাম স্মরণাতীতকাল আগের ভাঙা শহর—প্রকাণ্ড সেই ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে তুলনা হয় না কোনও কিছুর। তিরিশ লক্ষ বছর পরে যা দেখলাম তা-ই যথেষ্ট, এর চাইতে বেশি কিছু আশা করা অন্যায়। এস্কিমোদের উপকথা যে একেবারে মিথ্যা নয়—এই ভগ্নস্তূপই তার প্রমাণ।

নকশা মিলিয়ে সেখানে পথের নিশানা বার করা নিতান্ত অসম্ভব মনে হল। লক্ষ লক্ষ বছরের সেসব স্তর ডিনামাইটের ঘায়ে রেণু রেণু করে, কখনও বা কোদাল-গাঁইতি দিয়ে পথ করে নিয়ে কীভাবে এগিয়েছিলাম, সে কাহিনি আর-একদিন বলব। মোট কথা, অমানুষিক পরিশ্রমের পর, বহুবার ভুল পথের গোলকধাঁধায় দিনের পর দিন সেই বরফের প্রান্তরে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার পর পেলাম নকশা অনুযায়ী গোপন সুড়ঙ্গের নিশানা।

মস্ত বড় একটা পাথরের চাঙড় অনেকগুলো ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর, প্রবেশপথের ওপর দাঁড়ালাম আমি আর কিন্তনুলাল। চওড়া পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে পৃথিবীর বুকে। ধাপগুলো যেমন উঁচু, তেমনি চওড়া। মানুষ-কারিগরের হাতে সে ধাপের সৃষ্টি হলেও মানুষের ব্যবহারের জন্যে তা তৈরি হয়নি। অনেক কষ্টে সেই অতিকায় সিঁড়ি বেয়ে কেমন করে নিচে নেমেছিলাম, সে বর্ণনা তোমায় দেব না। কেমন করে প্রথম চাতাল, দ্বিতীয় চাতাল, তৃতীয় চাতাল পেরিয়ে পৃথিবীর উষ্ণ থেকে উষ্ণতর জঠরে প্রবেশ করেছিলাম, সে বর্ণনাও শোনাব না, শুধু বলব দীর্ঘ সময় পরে মাটির নিচের প্রকাণ্ড হলঘরে পৌঁছে, ঘরের ঠিক মাঝখানে বিশাল সিংহাসনে সমাসীন মূর্তিটা দেখামাত্র জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল কিন্তনুলাল।

‘থাক সে মূর্তির বর্ণনা। ভাষা দিয়ে যে ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা যায় না, তা আর না-ই বা শোনালাম। প্রকাণ্ড হলঘরের একদিকে ছিল চারকোনা একটা জলাধার। তার কিনারাতে হাতির দাঁতের মতো ধবধবে সাদা কোনও বিশাল জানোয়ারের

মোটা মোটা হাড় দিয়ে তৈরি সিংহাসনে বসে ছিল মূর্তিটা। নিথর, নিষ্কম্প। বসে থাকা অবস্থাতেই মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচুতে ছিল মাথাটা। সে কী মাথা! আমার দুরন্ত কল্পনাও সে দিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বিধাতার সেই অসম্ভব সৃষ্টি দেখে। শিল্পীর কোনও রং, কোনও তুলি, কোনও ভাষা সে বীভৎসতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।'

এস্কিমোদের প্রায় লুপ্ত একটা উপজাতির কাছে শোনা উপকথায় আর পুরানো পুঁথি পড়ে জেনেছিলাম, ভিন গ্রহ থেকে স্মরণাতীতকাল আগে পৃথিবীর বুকে এসে পড়েছিল এই ক'টি দানবমূর্তি। যুগ যুগ ধরে মানুষ তাদের পূজা করে এসেছে, অসংখ্য জীবন বলি দিয়ে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছে তাদের নিঃসাড় দেহে, উষ্ণ রুধির দিয়ে মিটিয়েছে ক্ষুধিত দেবতাদের রক্ত-পিপাসা!

'অসম্ভব! ভাবছ বুঝি আবার মাথাখারাপ হল আমার। না, বন্ধু, না। করঞ্জাক্ষ মিথ্যা বলে না। তারপর শোন। কীভাবে মশালের আলোয় মাটির তলার গহ্বর থেকে মূর্তিটাকে সিংহাসন সমেত তুলে এনে বিশাল বাক্সে পুরে স্বদেশে ফিরেছিলাম,সে কাহিনি এত বড় আর বিচিত্র যে, বলে তোমাকে বিরক্ত করব না। নতুন জীবন আহুতি দিয়ে লক্ষ লক্ষ বছর পরে সেই বিজন প্রান্তরে মূর্তিটার বুকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়ার সাহস তখন হয়নি—ভেবেছিলাম, দেশে ফিরে একদিন জাগাব ওই বিভীষিকাকে।'

কথা বন্ধ করে ড্রয়ার টেনে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ বার করল করঞ্জাক্ষ। প্রতিটি ছবি ফুল সাইজ এনলার্জমেন্ট করা। একটা ছবি বেছে নিয়ে নিজের সামনে উলটে রেখে বাকি ছবিগুলো শান্তনুর হাতে তুলে দিল সে। এক-একটা ছবিতে এক-একরকম দৃশ্য। একটাতে রয়েছে বরফের বুকে অভিযানের দৃশ্য। স্লেজগাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে কুকুরের পাল, কাঁধে-পিঠে বোঝা নিয়ে সার বেঁধে চলেছে এস্কিমো কুলিরা। কোনওটায় ফুটে উঠেছে বিরাট এক ধ্বংসস্তূপের আবছা রেখা। এত বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে যে ইমারত গড়ে উঠেছিল একদিন, তা ছবি দেখেও বিশ্বাস করল না শান্তনু। বিরাট পাথরের চাঙড়, থামের ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে আছে এদিকে-সেদিকে। তুষার-ঝড়ে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছবিগুলো। একটা ছবি ফ্ল্যাশ লাইটে তোলা। প্রকাণ্ড একটা হলঘর, এত বড় যে ফ্ল্যাশের আলো অপর সীমা পর্যন্ত আর পৌঁছায়নি। যেটুকু এসেছে আলোকের সীমানায়, সেটুকু দেখলেই তাক লেগে যায়। পাথরের দেওয়ালে অজস্র কারুকাজ, বেশিরভাগই সাংকেতিক হরফ, লিপি আর চিহ্ন। পাথরের বিরাট বিরাট চাঁই দিয়ে

তৈরি দেওয়ালে, আর অদ্ভুতগঠন সিলিং-এর সেসব দানবিক সাংকেতিক ছবির কোনও প্রতিলিপি শান্তনু কোনও গ্রন্থে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। কিছু দূরে একটা বড় সিংহাসন। এত বড় যে, এক নজরেই বোঝা যায়, কোনও মানুষের বসার জন্য তা তৈরি হয়নি। ফ্ল্যাশের আলোয় ঝকঝক করছে তার সাদা হাড়ের কারুকাজ। সিংহাসনের ঠিক মাঝখানে একটা বিচিত্র সাংকেতিক চিহ্ন দেখে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল শান্তনু। এই চিহ্নই দেখেছে সে কাঠের দরজার কুলুপের ওপর। কিন্তু বোঝে না কেন চিহ্নটা দেখামাত্র শিউরে ওঠে ও! এ কি নিছক মনোবিকার, না অলৌকিক প্রভাব!

ছবিগুলো দেখে কিন্তু নিজের মনেই হেসে নিল শান্তনু। করঞ্জাক্ষ ধড়িবাজ হতে পারে, কিন্তু এত সহজে তার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। একটু অর্থ, উদ্যম আর সময় খরচ করলেই এসব ছবি করঞ্জাক্ষের মতো শিল্পীর পক্ষে তোলা কিছু অসম্ভব নয়। দেওয়ালে কারুকাজ করা ঘরের মাঝে অতিকায় সিংহাসনটা তো যে কোনও প্রথম শ্রেনির স্টেজের সেটে খাড়া করা যায়। মুখে কিছু না বলে ছবিগুলো শান্তনু ফিরিয়ে দেয় করঞ্জাক্ষকে। উন্মাদকে চটিয়ে লাভ কী?

ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চলল করঞ্জাক্ষ;

‘এর আগেও অনেকবার অনেক অভিযানে গেছি, অনেক জিনিসও এনেছি সঙ্গে। কিন্তু সেই প্রথম এমন একটা জিনিস আনলাম,যার নিষ্প্রাণ দেহে খুশিমতো জাগিয়ে তোলা যায় প্রাণের ডমরুধ্বনি। লোকের সামনে এ জিনিস আমি হাজির করিনি, কেন না অনেকগুলো দরকারি কাজ করা হয়নি তখনও। তন্ত্রপ্রধান গৌড় দেশে তোমার জন্ম, তুমি তো জানই, আগম নিগম ইত্যাদি শাস্ত্রমতে তন্ত্রধারকের নিষ্ঠায়, উদ্যমে জড়পদার্থের মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার করা যায়। এ জন্যে চাই বলি, চাই তাজা রক্তের আহুতি। খর্পরভরা উষ্ণ শোণিতের অর্ঘ নিবেদন করে আমার এ বিভীষিকাকেও জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। অবশ্য যে ধরনের বলি পেয়ে পুরাকালে তার তৃপ্তি ঘটেছে,তা আর এ জগতে বিচরণ করে না। তবুও রক্তের একটা নিজস্ব মূল্য আছে। রক্ত মানেই জীবন। জীবনের শত সহস্র উচ্ছ্বাস, ক্রন্দন, হর্ষ, উল্লাস, জটিলতা, সরলতা নিবিড় হয়ে মিশে আছে তাজা রক্তের প্রতিটি কোষে কোষে। এই শোণিত অর্ঘ দিয়েই ভাঙতে হবে লক্ষ বছরের সুপ্তিকে। উপজাতিদের উপদেবতা সে—জীবনের উপচার না পেলে কেন সে সজীব করে তুলবে তার রক্তহিম করা ভয়াল রূপকে।’

ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল করঞ্জাক্ষ, আর তালে তালে উন্মাদ উল্লাসে পালটে যাচ্ছিল তার মুখচ্ছবি। তার দুই চোখের খেপা চাহনি দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে শান্তনু। একটু নার্ভাস যে হয়নি, তা নয়। দেখে নিষ্ঠুর আনন্দে আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে করঞ্জাক্ষের বর্ণনাভঙ্গী।

'গত বছর পেয়েছিলাম জিনিসটা। তারপর থেকে একটি দিনও বিরাম দিইনি। প্রতিদিন মিউজিয়ামের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই চেষ্টা করেছি একে জাগাতে। মন্ত্রপ্রয়োগ, তন্ত্রমতে উপাসন, আদিম প্রথায় অলৌকিকের সাধনা কিছুই বাদ রাখিনি। দেশ বিদেশ ঘুরে যেখানে যা শিখেছিলাম, যা পেয়েছিলাম তা-ই দিয়েই একনাগাড়ে সাধনা করে এসেছি এই মূর্তিমান বিভীষিকাকে জাগরূক রূপে দেখতে। সাধনা করেছি একলা, কিন্তনুলালের কোনও সাহায্য পাইনি। এ বিভীষিকাকে সে জাগিয়ে তুলতে চায় না প্রথম থেকেই। ভয় তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধে আছে। তার বিশ্বাস, একে জাগিয়ে তুললে নাকি আমি সমাজের সভ্যতার চরম সর্বনাশ করব। সবসময়ে তাই পকেটে পিস্তল নিয়ে বেড়ায় কিন্তনু। উন্মাদ! পিস্তল দিয়ে ঠেকাবে সে কালান্তকের আলিঙ্গনকে। যাক, যা বলছিলাম, আমার চেষ্টার বিরাম ছিল না। প্রতিটি পল, প্রতিটি অনুপল উৎকণ্ঠায়-উদ্‌বেগে আকুল হয়ে যে সাধনা করে এসেছি পুরো একটি বছর ধরে, তার সিদ্ধিলাভ ঘটেছে গত হপ্তায়। জেগেছে আমার দেবতা! শুধু জাগেনি, বলি গ্রহণ করেছে! লক্ষ লক্ষ বছরের সুপ্তির ঘোর কাটিয়েছে। তাজা রক্তের অর্ঘে। বহু বলিদানের পর, বহু মন্ত্র উচ্চারণের পর, বহু আরাধনার পর অবশেষে সফল হয়েছে আমার দুর্জয় সাধনা।'

পৈশাচিক উল্লাসে জ্বলজ্বল করছিল করঞ্জাক্ষের দুই চোখ। শান্তনু কিন্তু মেরুদণ্ড শক্ত করে আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল। কথা থামিয়ে উঠে দাঁড়াল করঞ্জাক্ষ,তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল চটের ছালাটার দিকে। কথা বলতে বলতে কেন সে ছালাটার দিকে বারবার চকিত চাহনি ফেলছিল তা বোঝেনি শান্তনু। কিন্তু এখন করঞ্জাক্ষকে নিচু হয়ে ছালাটার একটা কোনা ধরতে দেখে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল সে। ভেতর থেকে তার অন্তরাত্মা যেন ফিসফিস করে তাকে হুঁশিয়ার করে দিল—'দেখো না, শান্তনু, দেখো না এ দৃশ্য। সহ্য করতে পারবে না তুমি!'

শান্তনুর এই ভাবান্তর লক্ষ করে ক্রুর হেসে উঠল করঞ্জাক্ষ। বলল, 'আমার কথা তোমার কাছে প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। আমার সাধনাকে নিয়ে

ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতেও ছাড়নি। আজ এসেছে আমার পালা—তোমার সামনে প্রমাণ হাজির করার। কিন্তনুলালের কাছে শুনলাম, বিকেলের দিকে এদিকে কোথায় কুকুরের মরণ-চিৎকার শুনেছ তুমি। জান,তার মানে কী?'

শান্তনু শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল। কৌতূহল তার মিটুক আর না মিটুক, এই মুহূর্তে এই পাতালঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারলেই বেঁচে যেত সে। যে রহস্য তাকে উদ্‌বেলিত করেছে, থাকুক তা যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরে। কিন্তু গোঁয়ার করঞ্জাক্ষ ততক্ষণে ছালাটার কোণ তুলতে শুরু করে দিয়েছে।

পরমুহূর্তে চোখে পড়ল একটা থেঁতলানো, দলা পাকানো বস্তু। জিনিসটা যে কী তা প্রথমে শান্তনু বুঝে উঠল না। কার অমানুষিক নিষ্পেষণে হাড়গোড়-ভাঙা বস্তুটির মধ্যে কোনও দিন প্রাণের আভাস ছিল কি না তা বলা মুশকিল। কে যেন মাংসপিণ্ডটায় শতসহস্র ছেঁদা করে ভেতরকার শেষ রক্তবিন্দুটাও নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল শান্তনুর মনের কুয়াশা। বুঝল, চোখের সামনে কিম্ভূতকিমাকার যে পিণ্ডটা দেখছে, সেটা একটা কুকুরের দেহাবশেষ। বেশ বড় আকারের কুকুর—গায়ের রং বোধহয় সাদা। জাত চেনার সাধ্য হল না শান্তনুর—কেননা অবর্ণনীয়ভাবে সমস্ত দেহটা চেপটে থেঁতলে বিকৃত হয়ে কদাকার মাংসপিণ্ডে এসে ঠেকেছে। অধিকাংশ লোম অ্যাসিড জাতীয় কোনও উগ্র পদার্থে জ্বলে গেছে, আর গায়ের চামড়া ঝাঁজরা হয়ে গেছে অগণিত বৃত্তাকার ছেঁদায়। এ পরিণতি যে অত্যাচারের পর সম্ভব, তা কল্পনাতেও আনা যায় না।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে গেল শান্তনু। ভয়ে ঘৃণায় চেঁচিয়ে উঠল ভাঙা গলায়, 'স্কাউন্ড্রেল! স্যাডিস্ট! তোমার এই নৃশংস কীর্তি আমাকে দেখাতেও তোমার লজ্জা হল না।'

তার মানে? চটটা চাপা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল করঞ্জাক্ষ—দুই চোখে তার বিচ্ছুরিত বিদ্বেষ। 'বলতে চাও যে এ কাজ আমার? এ রূপান্তর কি মানুষের হাতে সম্ভব? সে চেয়েছিল বলির প্রাণী, আমি তাকে দিয়েছি সজীব শ্বাপদকে। সে তাকে গ্রহণ করেছে নিজের পন্থায়। আমি তাতে কী করতে পারি? আমি দিয়েছি বলি—সে মিটিয়েছে তৃষ্ণা। কিন্তু এস, দেখাই তোমায় আমার দেবতাকে।'

বলে, টেবিলের ওপর উপুড় করে রাখা ফোটোগ্রাফটি তুলে নিয়ে করঞ্জাক্ষ কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকার পর তুলে দিল শান্তনুর হাতে। যন্ত্রের মতো

হাত পেতে ছবিটা নিল সে। কিন্তু চোখের সামনে ছবিটা ধরার পর দেখতে দেখতে পালটে গেল তার মুখ-চোখের ভাব, দ্রুত হয়ে উঠল শ্বাসপ্রশ্বাস, থিরথির করে কেঁপে উঠল অজানা ভয়ের ছায়া তার চোখের তারায় তারায়। এ-ও কি সম্ভব? করঞ্জাক্ষের কল্পনা কি এমনই দুর্বার, এমনই দুরন্ত যে, দুঃস্বপ্নের অশরীরী বিভীষিকাই মূর্ত হয়ে উঠেছে শরীরী রূপে তার মোমের কারখানায়? এ কী ভয়াল সৃষ্টি! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সম্মোহনের মত একটা রিমিঝিমি প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তনু-মনের অণু-পরমাণুতে। করঞ্জাক্ষের এই নারকীয় মডেল জনসাধারণের মধ্যে যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তা ভেবে শঙ্কিত হল শান্তনু। এ বিভীষিকার অস্তিত্ব থাকাই উচিত নয়। লোকচক্ষুর সামনে আনা তো দূরের কথা—কী কুৎসিত, অথচ কী ভয়ংকর। যে ধ্যান-ধারণা থেকে মূর্তির সৃষ্টি, তা যে উন্মত্ত, তাতে সন্দেহ নেই। আর মডেল সম্পূর্ণ হওয়ার পর এ উন্মত্ততাও হয়েছে সম্পূর্ণ। চোখের সামনে নিজের এই ভয়াল সুন্দর সৃষ্টি বারবার দেখে অসুস্থ মনে করা একে তার নিজের উপাস্য বলেই ভেবে নিয়েছে—তাই অসংখ্য বলিদান দিয়ে দেবতার তৃষ্ণা মেটানোর নাম করে মিটিয়েছে নিজের বিকৃত মনেরই রক্তাক্ত লাল। বদ্ধ উন্মাদ না হলে কেউ ভাবতে পারে না যে একদিন, সে যতদিন আগেই হোক না কেন, এই কদাকার জিনিসটার মধ্যে প্রাণের দুন্দুভিধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

দানবিক চিহ্ন-সংকেতে খোদাই করা একটা বিচিত্র গঠনের সিংহাসনজাতীয় প্রকাণ্ড আসনের ওপর বসে ছিল জিনিসটা। করঞ্জাক্ষ ঠিকই বলেছে, ভাষা দিয়ে এ মূর্তির বর্ণনা দেওয়া যায় না, কেননা মানুষের সুস্থ চিন্তাধারায় কোনওদিন এ মূর্তির কল্পনা স্থান পায়নি। বিপুল তার আকার। কেননা, বসা অবস্থায় পাশে দাঁড়ানো কিন্তনুলালের প্রায় দ্বিগুণ উঁচুতে রয়েছে তার মাথা। ভিন গ্রহের মেরুদণ্ডী জীবটির এই যদি আকার হয়, তাহলে অন্য বিশাল আকারের জীবগুলোর আকার-আয়তন ভাবলেও অবাক হতে হয়।

গ্লোবের মতো প্রায় গোলাকার একটা কবন্ধ, মোটা মোটা ছ-টা কিলবিলে শুঁড় বেরিয়ে এসেছে তা থেকে, প্রত্যেকটির প্রান্তে কাঁকড়ার মতো সুতীক্ষ্ণ দাঁড়াওয়ালা থাবা। কবন্ধের ওপরে আর একটা বর্তুলাকার অংশ বুদবুদের মতো ঠেলে উঠেছে। এই অংশটিতে রয়েছে ত্রিভুজের তিন কোণে বসানো মাছির মতো ড্যাবডেবে তিনটে চোখ—তিনটে চোখের ঠিক মাঝখানে হাতির শুঁড়ের মতো এক ফুট লম্বা একটা প্রত্যঙ্গ। আর পাশের দিকে মাছের কানকোর মতো খাঁজকাটা। এইসব দেখেই শান্তনু বুঝল বুদবুদের মতো জিনিসটা একটা মাথা। দেহের বেশির

ভাগ অংশ পুরু লোমে ঢাকা। কিন্তু ভালো করে দেখতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝল শান্তনু। লোম নয়, অসংখ্য সাপের মতো সরু সরু শুঁড়ে বোঝাই সমস্ত দেহ, প্রতিটি শুঁড়ের প্রান্ত বিষধর সাপের মতোই হিংস্র আর জোঁকের মতো রক্তলোলুপ,আর প্রতিটি শুঁড় যেন রক্ত শোষণের এক-একটি যন্ত্র। সাপের মতো অগণিত কিলবিলে শুঁড় এমনই নিবিড় যে হঠাৎ দেখলে লোম বলে মনে হয়। মাথার ওপর আর তিন চোখের মাঝে মোটা শুঁড়টার নিচে লোমের মতো এই শুঁড়গুলো এত বড় আর পাকানো যে দেখলে মনে হয়, যেন অসংখ্য সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে মরণঘুমে। মাছের মতো তিনটে ড্যাবডেবে চোখ নিষ্প্রাণ হলেও নির্ভাষ নয়। জিঘাংসা, লোভ, ক্রোধ ছাড়াও আরও যেসব ভাব সে চোখে ফুটে উঠেছে, তার ব্যাখ্যা এ জগতের ভাষায় সম্ভব নয়। কেননা, ভিন গ্রহের এ ভাবরাশির সঙ্গে পরিচয় কোথায় শান্তনুর। সাদা তিনটে চোখে যেন নরকের ধিকিধিকি আগুনের রোশনাই দেখতে পেল সে। বাহাদুরি আছে বটে করঞ্জাক্ষের। যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, কল্পনায় আনা যায় না, তা-ই সে ফুটিয়ে তুলেছে তুলি আর মোম দিয়ে। এই অলৌকিক সৃষ্টি হয়ে থাকবে তার উন্মাদ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। করঞ্জাক্ষের মুখে এর বর্ণনা শুনলে বিশ্বাস করত না শান্তনু—কিন্তু জিনিসটার অস্তিত্ব যে আছে,এই ফোটোগ্রাফই তার প্রমাণ।

করঞ্জাক্ষের কথায় সমবিৎ ফিরে পেল শান্তনু।

‘কী হে, একেবারে তন্ময় হয়ে গেলে যে! এখন নিশ্চয় বুঝছ কুকুরটার ওই অবস্থা হওয়ার কারণটা কী। অমানুষিক শক্তি দিয়ে বেচারিকে দুমড়ে-মুচড়ে লক্ষ মুখ দিয়ে রক্ত শোষণ করেছে যে, তার ফোটো দেখেও বিশ্বাস হল তো? মিথ্যে বড়াই করঞ্জাক্ষ কোনও দিন করে না—’

‘থাম!’ গর্জে ওঠে শান্তনু। ‘ঢের হয়েছে, এবার দয়া করে থাম। কুকুরটাকে কীভাবে মেরেছ জানি না, কিন্তু মূর্তিটা পরিকল্পনা করার জন্যে তোমায় বাহাদুরি দিই, তোমার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করি। কিন্তু করঞ্জাক্ষ—’

‘তার মানে এখনও তোমার বিশ্বাস যে মূর্তিটা আমার হাতে তৈরি একটা মোমের পুতুল?’

‘বলা বাহুল্য। হয় তুমি পাগল হয়েছ, আর না হয় পাগল হতে বিশেষ আর দেরি নেই। এসব বদ খেয়াল ছাড় করঞ্জাক্ষ। জঘন্য মূর্তিটা নষ্ট করে ফেল, তার আগে ছিঁড়ে ফেল এই ছবিখানা—’

এক ঝটকায় ফোটোখানা শান্তনুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল করঞ্জাক্ষ। চোখ-মুখ তার ভীষণ হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বলল, ‘নাস্তিক। এখনও অবিশ্বাস!’

কোনও জবাব দিল না শান্তনু। টেবিলের ওপর থেকে বেড়াবার ছড়িটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

কিন্তু পথ রোধ করে দাঁড়াল করঞ্জাক্ষ। রাগে জ্বলজ্বল করছে তার দুই চোখ। ‘পালাচ্ছ? ভয় পেয়ে পালাচ্ছ বীরপুংগব।’

বিরক্ত কণ্ঠে বলল শান্তনু, ‘পথ ছাড়। আমাকে কচি খোকা পাওনি যে তোমার গাঁজাখুরি গল্প শুনে আর একটা মোমের দানবের ছবি দেখে ভয়ে মূর্ছা যাব। তোমার এ ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। চলে যাচ্ছি সেই কারণেই—ভয়ে নয়।’

একই রকম বিষাক্ত সুরে বলল করঞ্জাক্ষ, ‘না, তুমি মস্ত বীর কিনা, ভয় পাবে কেন। ভয় যদি না পাবে, তাহলে থাক এখানে। দেখি তোমার কত সাহস। সাহস যদি থাকে, তবেই বুঝবে, আমি সত্য বলছি কি মিথ্যে বলছি। কত প্রমাণ চাও? সমস্ত পাবে, যদি এখানে রাত কাটানোর মতো দুঃসাহস তোমার থাকে।’

করঞ্জাক্ষের স্বরে শুধু বিষ নয়, যেন আরও প্রচ্ছন্ন মতলবের ইশারা পায় শান্তনু। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাতেও একটা মতলব খেলে যায়। বলে, ‘শুধু একরাত থাকলেই প্রমাণ পাব? বেশ, রাজি আছি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।’

‘কী শর্ত?’

‘সারারাত এ ঘরে যদি থাকতে পারি, তাহলে প্রথমেই তুমি ওই দানবটাকে নষ্ট করে ফেলবে। তারপর মিউজিয়ামের ভার কিন্তনুলালের হাতে দিয়ে তিন মাসের জন্যে যাবে হাওয়া পরিবর্তনে। রাজি?’

অপলকে তাকিয়ে ছিল করঞ্জাক্ষ, শুধু তাকিয়ে ছিল না, ভাবছিল। সমস্ত মুখ থমথম করছিল বিচিত্র ভাবের খেলায়। সে মুখে রাগের কালো মেঘের পাশাপাশি খেলা করছিল চাপা উল্লাসের নিঠুর আলো।

‘রাজি।’ অবশেষে বলল করঞ্জাক্ষ, ‘এই ঘরেই থাকবে তুমি। ভেতরের ঘরে ওই ভয়ংকর মূর্তিটার সামনে পাঠিয়ে তোমার হার্টফেল করাব না। সকালবেলা কিন্তনুলাল আসার আগে আমি এসে তালা খুলব বাইরের দরজার। এখন যাও, খেয়ে এস। রাত ঠিক এগারোটার সময় আমি হাজির হব।’

কারখানা ছেড়ে বেরনোর আগে ভারী ছালাটা টেনে এনে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে ঢাকনা বন্ধ করে দিল করঞ্জাক্ষ।

রাতের খাওয়া সেরে রাত্রিবাসের উপযুক্ত কয়েকটা টুকিটাকি সরঞ্জাম নিল শান্তনু। বাড়িতে বলে এল, বন্ধুর বাড়িতে রাত পর্যন্ত তাস খেলবে—কাল ভোরে ফিরবে বাড়ি।

রাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল করঞ্জাক্ষ। শান্তনু আসতে দুজনে এগল কারখানাঘরের দিকে। কথাবার্তা বিশেষ কিছু হল না। সব ক-টা আলো নেবানো অন্ধকার মিউজিয়াম-ঘরে শান্তনুকে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল করঞ্জাক্ষ। বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল, ভেসে এল তালা লাগানোর আওয়াজ, তারপর করঞ্জাক্ষের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

সেই কুচকুচে কালো অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে সেই প্রথম শান্তনু উপলব্ধি করল, ঝোঁকের মাথায় কাজটা বোধহয় ঠিক হল না।

ইংরেজিতে ‘প্রি-মনিশন’ বলে একটা কথা আছে। দূরাগত বিপদের পূর্বাভাস বা সংকেত অজান্তেই মনের ওপর আস্তে আস্তে চেপে বসে মাকড়সার মতো। শান্তনুরও হল তা-ই। মিশমিশে অন্ধকারে চারপাশের অগুনতি দত্যিদানোর মাঝে কিছুক্ষণ কাটাবার পরেই মনে হল, কেন মনে হল তা সে জানে না, কিন্তু মনে হল, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হল না। তার উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎ। করঞ্জাক্ষকে সে মানুষ হিসাবে ভালোবাসে, তার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করে। আর প্রতিভামাত্রই খামখেয়ালের লক্ষ্যহীন পথে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। কিন্তু করঞ্জাক্ষের খামখেয়াল যে উন্মত্ততায় পরিণত হতে চলেছে। এ সময়ে তাকে দূরে টেনে নিয়ে যাওয়াই তো প্রকৃত বন্ধুর কাজ।

কিন্তু অসহ্য এই মিউজিয়ামের নিস্তব্ধতা। এরকম শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্য আর কাজলকালো আঁধারে থাকার দুর্ভাগ্য এর আগে শান্তনুর হয়নি। তাই বোঝেনি কী নিদারুণ সে অভিজ্ঞতা। তার ওপরে আশপাশের ওই বিদঘুটে বিকট করাল

মূর্তিগুলো! যতবার টর্চ ফেলেছে আনমনে, ততবারই চমকে উঠে চোখ বন্ধ করতে হয়েছে, আর না হয় আলো সরিয়ে নিতে হয়েছে। দিনের আলোয় যেসব ভীষণ জন্তুর মূর্তিগুলো দেখে সে কৌতুক পেয়েছে, রাতের তমিস্রায় সেইগুলিই জীবন্ত হয়ে উঠে নিঃশব্দে ক্রূর হেসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তাকে। সবই মনের বিকার, মনে মনেই বলে শান্তনু, তবুও মন থেকে চিন্তাগুলো তাড়াতে পারে না। ড্রাগন, হায়না মুখো দানো আর ছিন্নমস্তার উপস্থিতি তাকে যতটা না অস্বস্তি দিল, তার চেয়েও অসহ্য লাগল কোনার পরদা দিয়ে ঘেরা 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' অংশটা। পরদার আড়ালে যেসব অসম্ভব দুঃস্বপ্ন আছে, তা দেখে দিনের আলোতেই ভিরমি খেয়েছে কতজনে, সুতরাং এ সময়ে তাদের না দেখাই উচিত মনে করে। সেদিকে আর টর্চের আলোই ফেলল না শান্তনু। ঘড়িতে দেখল রাত একটা। এখনও পুরো পাঁচ ঘণ্টা। ঘড়ি দেখতে গিয়ে টর্চের আলো ওপাশের গিলোটিনে পড়েছিল। কাঁচা রক্ত-মাখা ধারালো ব্লেডটা আস্তে আস্তে নেমে আসছে না? মনের বিকার ঠিকই। কিন্তু তবুও ভয় পেয়েছে শান্তনু। গা ছমছম করে ওঠে ওর।

আর, তারপরেই ক্লিক করে একটা শব্দ ভেসে এল নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে দিয়ে।

কারখানাঘরের দরজায় চাবি ঘোরার শব্দ।

অসম্ভব! টর্চের বোতাম টিপে ধরল শান্তনু। এক ঝলক দুধের মতো সাদা আলো লাফিয়ে ওঠে কাঠের মজবুত পাল্লা দুটোর ওপর। কিন্তু না, ঠিকই আছে। কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই। তারই মনের ভুল।

নিবে গেল আলো। পরমুহূর্তে জাগল আর-একটা নতুন শব্দ।

খুব আস্তে আস্তে পাল্লা দুটো যেন কবজার ওপর ঘুরে যাচ্ছে। ভারী দরজার তৈলহীন কবজা—কাজেই আস্তে আস্তে ঘুরলেও শব্দ ঢাকা গেল না।

একসময়ে তা-ও স্তব্ধ হল। এবার জাগল আর-একটি শব্দ।

ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠল শান্তনু। আলো সে জ্বালাবে না, কিছুতেই না। আলো জ্বালানো মানেই ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া। এসব আওয়াজ স্নায়ুর বিকার ছাড়া কিছু নয়—এতক্ষণ একলা আজেবাজে চিন্তা করার ফল।

কিন্তু শব্দটা যে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কে যেন অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে তার দিকে। খুব মৃদু খসখস শব্দ—তবুও কান এড়ায় না।

ভয় পাবে না শান্তনু, কিছুতেই না। এরকম পরিবেশে একবার ভয়ের চক্রে জড়িয়ে পড়লে আর নিস্তার নেই। তাই বেসুরো ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ও—'কে, কে ওখানে? সাড়া দাও। কে তুমি?'

দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল প্রতিধ্বনি—কোনও সাড়া নেই। কিন্তু অবিরাম রইল সেই খসখস শব্দ। মার্জারের মতো লঘু চরণে কে যেন এগিয়ে আসছে আর আসছে। বিরাম নেই—বিরতি নেই, এগিয়ে আসছে। আর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে খসখস শব্দ। এ ঘরের সব বিভীষিকাই যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে ওই সংকেতময় লঘু পদক্ষেপের মধ্যে।

ফট করে টর্চের বোতাম টিপে ধরল শান্তনু—আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে উঠল নিদারুণ আতঙ্কে। একবার নয়—বারবার।

অন্ধকারের মধ্যে পা টিপে টিপে তার দিকে এগিয়ে আসছে একটা জীবন্ত বিভীষিকা—মূর্তিমান আতঙ্ক। বিরাট কালো কুচকুচে চেহারা,পুরোপুরি বানর নয়,সরীসৃপও নয়। আগুন-রাঙা দুই চোখ সমেত মস্ত মাথাটা মাতালের মতো দুলছে এপাশে-ওপাশে। কাঁকড়ার মতো সুচালো দাঁড়াওয়ালা চার-চারটে থাবা সামনের দিকে প্রসারিত—ঝুঁকে পড়া দেহটা থেকে যেন জিঘাংসা আর নৃশংসতা ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর্ত চিৎকারের পর চিৎকারের শেষে আলোটা নিবে যাবার ঠিক আগেই লাফিয়ে উঠল মূর্তিটা, পলকের মধ্যে মাটিতে পেড়ে ফেলে চেপে ধরল শান্তনুকে।

কোনও রকম ধস্তাধস্তি হল না, কেননা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল শান্তনু। বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থা রইল না তার। নামহীন দানবটা তাকে মেঝের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবার সময়ে একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে আসছিল। আচ্ছন্নের ঘোর পুরোপুরি কেটে গেল দানবটার চিৎকার শুনে। গলাটা মানুষের এবং খুব চেনা। পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষের কণ্ঠেই এমন মেঘ ডাকার শব্দ, এমন গুরুগুরু দুন্দুভি-নিনাদ বেজে ওঠে।

'লা! লা! জাগো, রান-টেগথ, তুমি জাগ। আমি আসছি, আনছি তোমার খাদ্য। অযুত বছরের সুপ্তি ভেঙে তুমি জেগে উঠেছিলে—আমার আহ্বানে—কিন্তু দীর্ঘ

দিনের পিপাসা মেটেনি সামান্য কুকুরের রক্তে। তাই, আসছি আমি, এবার মেটাব তোমার আকণ্ঠ পিপাসা। অবিশ্বাসীর রক্তে স্নিগ্ধ হোক তোমার আতীব্র তৃষ্ণার জ্বালা। লা! রান-টেগথ! তুমি জাগ, গ্রহণ কর নাস্তিককে, লক্ষ মুখে তার শেষ রক্তবিন্দুটিও শোষণ করে প্রমাণ কর, তুমি শুধু মহাভয়ংকর নও, তুমি মহাশক্তিমান, অমর, অজেয়, অনন্ত। আমি তোমার গোলাম, আমি তোমার পূজারি। আমার মন্ত্রে তুমি জেগে ওঠ, গ্রহণ কর পানীয়—আর দাও আমায় শক্তি, অফুরন্ত শক্তি।'

'লা! রান-টেগথ! তুমি জাগ।'

সেই সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল মন্ত্র উচ্চারণ। চকিতে চনমনে হয়ে উঠল শান্তনু। নিমেষে মিলিয়ে গেল আতঙ্কের নাগপাশ। দানব নয়, এ তার উন্মাদ বন্ধু শিল্পী করঞ্জাক্ষ। উন্মত্ততার আর কিছুই বাকি নেই। নিজের ভয়াবহ কল্পনার সৃষ্টি দানবমূর্তির সামনে তাকে নিয়ে চলেছে বলিদানের জন্য। আশ্চর্য নয়। তার মতো ঘোর উন্মাদের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব এখন। পেছন দিকের উঠোনের দরজা দিয়ে নিশ্চয় কারখানা ঘরে ঢুকেছে সে। তারপর নিপুণ হাতে ছদ্মবেশ ধরেছে এক শরীরী বিভীষিকার, দক্ষ শিল্পীর মতো চলার মধ্যেও অমানবিক নিষ্ঠুরতাকে ফুটিয়ে তুলতে কসুর করেনি। তারপর দরজা খুলে ঢুকেছে মিউজিয়ামে—ফাঁদে-পড়া ভয়ে আধমরা বন্ধুকে বিকৃত খেয়ালের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে।

দ্রুত মুক্তির উপায় চিন্তা করতে লাগল শান্তনু। করঞ্জাক্ষ অসুরের মতো শক্তি ধরে। কাজেই ধস্তাধস্তি করে রেহাই পাওয়া সহজ নয়। অতর্কিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। করঞ্জাক্ষ জানে না, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে শান্তনু। তারই অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে আচমকা নিজেকে মুক্ত করে আনতে হবে। এই সময়ে সিঁড়ির ওপর এসে পড়তেই শান্তনু বুঝল করঞ্জাক্ষ চলেছে পাতালঘরে—কারখানার অন্ধকারে।

কতকটা ভয়ে, কতকটা মরিয়া হয়ে আচমকা এক হ্যাঁচকা টানে ছিটকে গেল শান্তনু। পরক্ষণেই লাফিয়ে পড়ল করঞ্জাক্ষের টুঁটি লক্ষ্য করে, কিন্তু সে জায়গায় মুখোশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কাজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করঞ্জাক্ষ সবলে জাপটে ধরল তাকে। তারপর দুজনেই হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে পাতালঘরে।

অন্ধকারের মধ্যে ভেসে এল শুধু ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ, বেঞ্চি উলটে পড়ার দুমদাম আওয়াজ। ঝটাপটি করতে করতে ওরা ঘরের মাঝখানে মোম গলানোর চুল্লিটার কাছে চলে এসেছিল। খেপা নেকড়ের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছিল করঞ্জাক্ষ। আর দাঁতে দাঁত টিপে আত্মরক্ষা করে চলেছিল শান্তনু নেকড়ের আঁচড়-কামড় থেকে। ধস্তাধস্তির প্রথম চোটটা কেটে যেতেই ফাঁকে ফাঁকে শুরু হল করঞ্জাক্ষের মন্ত্রোচ্চারণ। সে মন্ত্রের মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝল না শান্তনু,শুধু বারবার কানে ভেসে এল 'লা' আর 'রান-টেগথ' শব্দ দুটো। যেন অধীর হয়ে করঞ্জাক্ষ তাড়াতাড়ি জাগিয়ে তুলতে চাইছে গ্রহান্তরের বিভীষিকা 'রান-টেগথ'-কে। উন্মাদ শিল্পীর সাঁড়াশির মতো আলিঙ্গন থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি আর পেত না শান্তনু—যদি না ভাগ্য ওর সহায় হত। আচমকা করঞ্জাক্ষের বুকে হাঁটুর এক বেদম গুঁতো মারতেই শিথিল হয়ে গেল তার নাগপাশের মতো আলিঙ্গন। পরমুহূর্তেই বুঝল শান্তনু, জিত হল তারই।

চলতে চলতে কোনও মতে উঠে দাঁড়াল সে। টর্চটা ছিটকে পড়েছিল ধস্তাধস্তির সময়ে। কাজেই আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল আলোর সুইচটার দিকে। সুইচ টিপতেই আলোর বন্যায় ঝলমল করে উঠল পাতালঘর। জোরালো আলোয় করঞ্জাক্ষকে দেখে গা ঘিনঘিন করে ওঠে ওর। চুল্লির পাশেই অচেতন হয়ে পড়ে ছিল সে। খানিকটা চামড়া, খানিকটা প্লাস্টিক আর খানিকটা রেক্সিন দিয়ে অপূর্ব ছদ্মবেশ ধরেছে সে। মুখোশটা ছিঁড়ে ঝুলছিল কাঁধের ওপর। বাঁ দিকের গাল-বরাবর প্রায় এক বিঘত লম্বা একটা দগদগে কাটা থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল চুঁইয়ে চুঁইয়ে।

শান্তনুর প্রথম কাজই হল খানিকটা দড়ি জোগাড় করে শক্ত করে করঞ্জাক্ষকে বেঁধে ফেলা। খুনের নেশায় পাগল শিল্পীর একবার জ্ঞান ফিরে এলে আর রক্ষে নেই। নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই দেওয়ালের হুক থেকে পছন্দসই একটা পোশাক টেনে নিয়ে গায়ে গলিয়ে নিল শান্তনু। করঞ্জাক্ষের পকেট থেকে আগেই চাবির গোছাটা সংগ্রহ করেছিল সে। প্রথমেই এই পাতালপুরী থেকে বেরনো দরকার—খোলা হাওয়ায় ফুসফুসকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার পর ভাবা যাবে তার পরের প্রোগ্রাম।

উঠোনের দিকের দরজার সামনে পৌঁছে দেখল দরজায় স্প্রিং-এর লক লাগানো —ভেতর থেকে আপনা হতেই খুলে যায়, চাবির দরকার হয় না। পাল্লা খুলে

একটা পা বাইরে রেখেছে, এমন সময়ে জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল করঞ্জাক্ষ।

‘মূর্খ! অ্যাজাটথের জলাভূমির কুকুরের চেয়েও অধম! অমর হয়ে যেতে, পবিত্র হয়ে উঠত তোমার দূষিত দেহ-মন। বিশ্বাসঘাতক! কোথায় পালাচ্ছ তুমি? সাবধান—জাগ্রত হয়েছে রান-টেগথের বিপুল ক্ষুধা। তুমি অথবা কিন্তনুলাল—এই দুই অবিশ্বাসীর একজনকে দিয়ে মেটাব তার রুধির-তৃষ্ণা। প্রথম সম্মান তোমাকেই দিয়েছিলাম আমি। আর এখন তাকে ক্ষুধার্ত রেখে কাপুরুষের মতো পালাচ্ছ তুমি! ধিক তোমাকে!

‘লা! লা! জানো কীভাবে অমর করে রাখতাম তোমায়? চুল্লিটা দেখেছ? আগুন জ্বালবার আয়োজন সম্পূর্ণ, গামলাতে মোম তৈরি। যেভাবে অনেক জীবন্ত প্রাণীকে মোমের পুতুলে রূপান্তরিত করে রেখে দিয়েছি আমার মিউজিয়ামে, ঠিক সেইভাবেই রাখতাম তোমায়। হাঃ হাঃ হাঃ। বড় যে ব্যঙ্গ করতে, আমার সব মূর্তি নাকি নিছক মোমের পুতুল ছাড়া আর কিছু না, তোমাকেও ওইরকম একটা পুতুল বানিয়ে রেখে দিতাম। চুল্লিতে শুধু আগুন জ্বালাতে বাকি ছিল। আগুন জ্বলার পর মোম গলে যখন টলটলে হয়ে উঠত, আর তোমার চেহারা ওই কুকুরটার মতো চেপটে, থেতলে ঝাঁঝরা হয়ে উঠত, তখন রেখে দিতাম তোমায় অমর করে। মোম দিয়ে। আমাকে বড় দরের শিল্পী বলতে তুমি। আজ শুধু বলা নয়, উপলব্ধি করতে তোমার প্রাণহীন দেহের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে। মোম! গলা মোম ঝরে ঝরে পড়ত প্রতিটি রোমকূপে, দেহের প্রতিটি ইঞ্চিতে—লা! লা! তারপর সারা দুনিয়া তোমার চেহারাটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবত, কী আশ্চর্য ভয়ংকর কল্পনার অধিকারী শিল্পী করঞ্জাক্ষ। হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার পরেই আসত কিন্তনুলাল। এইভাবেই একে একে ভরে উঠত আমার মোমের মিউজিয়াম!

‘আহাম্মক! এখনও বুঝি ভাবছ মূর্তিগুলো নিছক কল্পনার সৃষ্টি, স্রেফ মোমের পুতুল। মূর্খ! তাই তোমাকে দিয়েই প্রমাণ করতাম যে তা নয়, স্পিরিটে ডুবিয়ে যেমন কীটপতঙ্গকে সংরক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা, তেমনি মোমের গলিত গরম ধারায় স্নান করিয়ে আমার পছন্দসই মানুষের দেহও আমি জিইয়ে রাখতে পারি। যেসব জায়গায় আমি গেছি,আর যেসব জিনিস এনে সাজিয়ে রেখেছি এ মিউজিয়ামে—তোমার মতো অবিশ্বাসী কল্পনাতেও আনতে পারবে না। কাঠের দরজার ওপাশে যে মূর্তিমান আতঙ্কটি প্রতীক্ষা করছে বলিদানের, তার সামনে যাওয়া তো দূরের কথা, তার ভয়াল রূপ পরিপূর্ণভাবে তোমার কল্পনায় ফুটে ওঠামাত্র

চিরতরে বিকল হয়ে যাবে তোমার হৃদযন্ত্র। লা! লা! জাগছে আমার দেবতা রান-টেগথ! ক্ষুধার্ত সে—চাই রক্ত, চাই জীবন!’

দেওয়ালের গা ঘষটে খাড়া হয়ে বসল করঞ্জাক্ষ, তারপর বাঁধা অবস্থাতেই দুলতে লাগল সামনে-পেছনে।

‘শান্তনু শোন, আমাকে ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার। আমি যে তার পূজারি। তোমাকে যে সম্মান দিতে চেয়েছিলাম, তা যখন তুমি প্রত্যাখ্যান করলে, তখন কিন্তনুলালই হবে তার উত্তরাধিকারী। তারপর তার মৃত্যুর পর, তার ফুটো ফুটো রক্তশূন্য দেহটা সাজিয়ে রেখে দেব আমার মিউজিয়ামে। আমাকে ছেড়ে দাও—বিনিময়ে দেব তোমায় অসামান্য শক্তি—যে শক্তি রান-টেগথের কাছ থেকে পাব আমি। লা! লা! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমায়, খুলে দাও আমার বাঁধন! ক্ষুধায় ছটফট করছে আমার দেবতা, এই ক্ষুধা অতৃপ্ত থেকে গেলে আর সে ফিরে আসবে না,আর কোন দিন সাড়া দেবে না আমার ডাকে। লা! লা! ছেড়ে দাও,শান্তনু, হাঃ হাঃ হাঃ।’

ঘোর উন্মাদ। শান্তনু অবাক হয়ে যায় যে, এরকম অবস্থাতেও করঞ্জাক্ষের দুর্বার কল্পনাশক্তি দুরন্ত উচ্চৈঃশ্রবার মত দুর্বার বেগে টগবগিয়ে ছুটে চলেছে। কুলুপ আঁটা পুরু দরজাটার দিকে বড় বড় চোখে উদ্ভ্রান্তের মত তাকাচ্ছিল করঞ্জাক্ষ আর সমানে মাথা ঠুকছিল ইঁটের দেওয়ালে। নিষ্ফল আক্রোশে দড়ি বাঁধা জোড়া পা ঠুকছিল মেঝের ওপর। মাথা ফাটিয়ে শেষকালে রক্তারক্তি কাণ্ড না করে ফেলে,তাই তাড়াতাড়ি শান্তনু এগিয়ে গেল তাকে শক্ত কোন খুঁটির সঙ্গে বাঁধার জন্যে। কিন্তু একে এগোতে দেখেই গড়িয়ে গড়িয়ে সরে যেতে লাগল করঞ্জাক্ষ,আর শুরু হল অশ্লীল অশ্রাব্য গালিগালাজ। সেই সঙ্গে দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ। কোন মানুষের কণ্ঠে যে এরকম অমানুষিক চিৎকার,এরকম দামামা-নিনাদ বেরোতে পারে,তা না শুনলে বিশ্বাস করত না শান্তনু। এরকম অবস্থা বেশিক্ষণ চললে পাগলা গারদে আর খবর দিতে হবে না,তারা নিজেরাই ছুটে আসবে।

‘জা-য়ে-ই! জা-য়ে-ই! ইকা-বা-ভো-ইঃ! রান-টেগথ—চুলু ফাহান—ই-আই! ই-আই! ই-আই!—রান-টেগথ, রান-টেগথ, রান টেগথ।’

গড়াতে গড়াতে তালা-আঁটা দরজার সামনে পৌঁছে গিয়েছিল করঞ্জাক্ষ। এখন শুরু হল দরজার ওপর মাথা কোটা। বিকট উন্মাদ চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সেই

দমাদম শব্দ শুনে সত্যিই শঙ্কিত হল শান্তনু। পাগল তো হয়ে গেছেই, কিন্তু এবার যে খুনের নেশায় নিজেকেই খুন করতে চলেছে করঞ্জাক্ষ। দরজার ওপাশে কী বিভীষিকা আছে, সে কথা মনে এল না শান্তনুর। যেভাবেই হোক করঞ্জাক্ষকে এখন কোনও ঘুমপাড়ানি ওষুধ খাইয়ে নিস্তেজ করে দেওয়া দরকার। তারপর ডাক্তার—

ঠিক তখনই কনকনে বরফের স্রোত নেমে গেল শান্তনুর শিরদাঁড়া বেয়ে। সংজ্ঞাহীন, নামহীন, কারণহীন আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেল দেহের প্রতিটি লোম। আচমকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল করঞ্জাক্ষের মাথা কোটা। সিধে হয়ে নিশ্চল দেহে বসে ছিল সে, ঘাড় কাত করে এক মনে শুনছিল... কী শুনছিল তা জানে না শান্তনু... কিন্তু ইথারের মধ্যে কীসের তরঙ্গ যেন আশার আবর্ত রচনা করেছিল তার কর্ণকুহরে।

আর, তারপরেই ধীরে ধীরে ক্রূর পৈশাচিক হাসি তার ঘৃণায় বঙ্কিম ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল রাঙা চোখের কালো মণিকায় আর দগদগে ক্ষতচিহ্ন আঁকা মুখে পরতে পরতে। শুরু হল ফিসফিসানি। রক্ত হিম করা বিষাক্ত স্বরে ফিসফিসিয়ে উঠে বলল—'শান্তনু, দোহাই তোমার, আমার বাঁধন খুলে দাও। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না, সে জেগেছে? শুনতে পাচ্ছ না জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ? চৌবাচ্চার জল ঠেলে সে উঠে আসছে। ইয়ুল গ্রহের জীব সে। সে গ্রহে সাগরের নিচে বারো মাস ডুবে থাকে দেশের শহর-গ্রাম। তাই তার ডেরা বানিয়ে দিয়েছিলাম গভীর চৌবাচ্চার মধ্যে। ঘুম ভেঙে গেছে তার আমার ডাকে। শান্তনু, লক্ষ্মীটি, আমায় ছেড়ে দাও! চল, দুজনে বেরিয়ে পড়ে কুকুর-ছাগল যা পাই এনে উপহার দিই তাকে। আমি তার পূজারি, ঘুম ভাঙালে তৃষ্ণার রক্ত যেভাবেই হোক জোগাতে হবে আমায়।'

এ যেন নিছক প্রলাপ নয়, এত দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কি কেউ প্রলাপ বকে? এ কি উন্মত্ততা? স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল শান্তনু। করঞ্জাক্ষের ফিসফিসানির আশ্চর্য বলিষ্ঠতায় বারবার যেন ঝনঝন করে উঠছিল তার যুক্তি-বুদ্ধির শক্ত শেকল। কুলুপ-আঁটা দরজার পেছনে কী আছে না আছে, তা সে ভাবল না মোটেই। কিন্তু করঞ্জাক্ষ যেন কথার ইন্দ্রজাল দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করে আনছে। তা না হলে কেন তার দুর্জয় সাহস লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে? কীসের ভয়ে শিহরিত হচ্ছে তার দেহ? এ কি সম্মোহন, না আরও কিছু? ঠিক এই মুহূর্তে, অকস্মাৎ এক ধাক্কায় যেন স্তব্ধ হয়ে এল তার উত্তাল হৃৎপিণ্ড। নিজের

বুদ্ধিশক্তির ওপর খবরদারি লোপ পেল নিমেষে, অসাড় হয়ে এল হাত-পা। করঞ্জাক্ষকে পেঁচিয়ে বাঁধার জন্যে হাতের চামড়ার বেল্টটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে। আচ্ছন্নের ঘোরে থরথর করে বারবার কেঁপে উঠল দেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত। এ ভয়াবহ পরিবেশে শুধু করঞ্জাক্ষ নয়, তার মতো সুস্থ মানুষও শেষে পাগল হয়ে গেল। সত্যিই পাগল হয়ে গেল, তা না হলে বিভীষিকার করাল ছায়া তার স্নায়ুতেই বা পড়বে কেন? উন্মাদ শিল্পী কথার তুলি দিয়ে তার মনের পটে এঁকেছিল দরজার ওপাশে বিরাট চৌবাচ্চায় এক দানবের ছবি… আর এখন, এখন, সে নিজের কানেই শুনতে পেল তার নড়াচড়ার ক্ষীণ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

শান্তনুর দুই বিস্ফারিত চোখে আচমকা আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি দেখে নিষ্ঠুর উল্লাসে ভাঙা গলায় হেসে উঠল করঞ্জাক্ষ।

‘যাক, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হল তোমার! মূর্খ! শুধু শুনেই তোমার এই অবস্থা! কিন্তু তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি খুলে দাও আমার বাঁধন, চল, দুজনে মিলে জোগাড় করি বলির উপচার।’

কোনও কথাই শান্তনুর মাথায় ঢুকল না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো অসাড় দেহে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আর ধীরে ধীরে দুনিয়ার পুঞ্জীভূত বিভীষিকা যেন মূর্ত হয়ে উঠছিল তার মনের চোখে। প্রথমে শুধু ভেসে এল ক্ষীণ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। তারপর থপ…থপ…থপ… যেন কঠিন জমির ওপর চলে বেড়াচ্ছে বিরাট বিরাট থাবা। শব্দটা এগিয়ে আসছে। উৎকট একটা গন্ধ ভেসে এল নাকে, গন্ধটা শুধু নোনা নয়, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গেলে যেমন বোটকা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়—এ যেন অনেকটা তেমনি, কিন্তু পুরোপুরি সেরকম নয়।

চোখের সামনে থেকে ইটের দেওয়াল, কাঠের দরজা ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। কানে ভেসে এল থপথপ শব্দের সঙ্গে আর-একটি নতুন শব্দ—হাপরের মতো শোঁ শোঁ আওয়াজের সঙ্গে রক্ত হিম করা এক অমানবিক চাপা গজরানি। আর সমানে এগিয়ে আসতে লাগল শব্দটা—থপ…থপ…থপ! ধীরস্থির পদক্ষেপে, তাড়াহুড়ো করার যেন কোনও প্রয়োজন নেই।

শান্তনুর আচ্ছন্ন চেতনায় ভেসে উঠল ফোটোগ্রাফে দেখা মোমের তৈরি সেই দানবের ছবি। দেখতে দেখতে শব্দ এগিয়ে এল আরও কাছে, তারপর মনে হল, কে যেন ওদিক থেকে আলতোভাবে ঠেলা দিচ্ছে দরজার পাল্লা দুটোয়। একবার, দুবার, তিনবার—মচমচ করে উঠল দরজার কুলুপ। তারপর শুরু হল ধাক্কা—

ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠতে লাগল তা, আর উৎকট গন্ধে গুলিয়ে উঠতে লাগল শান্তনুর সর্বাঙ্গ। বাড়তে লাগল ধুপ ধুপ শব্দ—যেন মস্ত বড় থাবা দিয়ে কে দুরমুশের মতো পিটিয়ে চলেছে দরজার পাল্লা দুটো। সে প্রচণ্ড ধাক্কায় থরথর করে কাঁপতে লাগল ইটের দেওয়াল, ঝনঝন করতে লাগল দরজার মোটা কড়া আর ভারী তালা। তারপরেই মড়মড় শব্দ—ছিটকে পড়ল কাঠের টুকরো আর কবজার ওপর কাত হয়ে পড়ল একটা ভারী পাল্লা…

আর, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কালো থাবায় কাঁকড়ার মতো দাঁড়া…

'বাঁচাও! বাঁচাও! আঁ-আঁ-য়া-য়া-য়া!…'

অনেক চেষ্টা করলে শান্তনু আজ শুধু মনে করতে পারে যে, আচমকা যেন শক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার আড়ষ্ট দেহে। তিন লাফে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে তালা এঁটে দিয়ে উন্মাদের মতো ছুটেছিল সে পাথুরে চত্বর পেরিয়ে বড় রাস্তায়।

তারপরে আর কিছু মনে নেই। কীভাবে বাড়ি ফিরেছিল সে রাত্রে, হেঁটে, না দৌড়ে, না গাড়িতে—তার কোনও স্মৃতি সে উপহার দিতে পারেনি মনোবিকারের চিকিৎসককে। ডাক্তার এসে কিন্তু মিউজিয়ামের বেখাপ্পা পোশাকই দেখেছিল তার পরনে।

এক হপ্তা পর চিকিৎসকের নির্দেশে সে বিছানা ছেড়ে বেরয় বাইরের খোলা বাতাসে হাঁটাচলার জন্যে।

ডাক্তারের কাছে কিন্তু সব কথা খুলে বলেনি শান্তনু। মিউজিয়ামের ওই ভয়ংকর পরিবেশে ঘুমের ঘোরে সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল তার নিজেরই। পরের দিন সকালেই খবরের কাগজ তন্নতন্ন করে পড়েছিল সে—কিন্তু বৃথা। মোমের মিউজিয়ামের বিভীষিকার ছিটেফোঁটা খবরও বেরয়নি কোনও কাগজে। তাইতেই সন্দেহ তার বেড়েছে বই কমেনি। পৃথিবীর মরুৎ-ব্যোম পেরিয়ে গ্রহান্তরের এ বিভীষিকা কল্পনা শুধু করঞ্জাক্ষের উর্বর মস্তিষ্কেই এসেছিল। তারই সৃষ্টি শিল্পকর্মের ছবি দেখেই হয়তো সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে সাজিয়ে নিয়েছে সে। আর মিশমিশে অন্ধকারে ভয়াবহ মূর্তিগুলোর মধ্যে বসে বারবার ওই কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই মনের আকাশে ফুটে উঠেছে ছবির মতন ঘটনাপ্রবাহ। এ-

ও একরকম মনোবিকার। করঞ্জাক্ষের সম্মোহনী সান্নিধ্য বর্জনই এর একমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসা।

তবুও দিন পনেরো ও মুখো হওয়ার সাহস হয়নি শান্তনুর। শরীর আর মন বেশ সুস্থ হয়ে উঠতে একদিন সে গুটিগুটি বেরিয়ে পড়ল মিউজিয়ামের দিকে। এসেছিল দিনের বেলায়—যখন দোকান-পসারিতে লোকজন আর পথেঘাটে যানবাহনের ভিড়। এই ঘটনার পর থেকে সন্ধ্যা নামলেই গা ছমছম করত ওর।

ফটকে ওকে দেখেই লম্বা সেলাম ঠুকল করঞ্জাক্ষের ভোজপুরই দরোয়ান। মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকতে কর্মচারীরা ওকে দেখে নমস্কার করে কুশল জিজ্ঞেস করল। দুরুদুরু বুকে শান্তনু ভাবল, করঞ্জাক্ষের সঙ্গে কারখানায় দেখা করাটা কি উচিত হবে?

এমন সময়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল কিন্তনুলাল। হাসিটা কিন্তু নির্মল নয়, খানিকটা কৌতুক, খানিকটা বিদ্রুপ যেন প্রচ্ছন্ন হয়েছে তাতে। বলল 'নমস্কার, ভালো আছেন তো? করঞ্জাক্ষবাবুর সঙ্গে যাবার আগে দেখা হয়নি আপনার? হয়নি? আশ্চর্য! হঠাৎ জরুরি কাজে বোম্বাই চলে গেছেন তিনি। কবে ফিরবেন, কোনও ঠিক নেই। আমার ওপরেই সব দেখাশোনার ভার পড়েছে। বাধ্য হয়ে অর্ডারগুলোও সাপ্লাই করতে হচ্ছে আমায়।'

উত্তরে বিড়বিড় করে কতকগুলো অসংলগ্ন প্রশ্ন করল শান্তনু। শুনে মুচকি হাসল কিন্তনুলাল। বলল, 'আটাশ তারিখে তো। সে দিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ চলেছিল কারখানায়। করঞ্জাক্ষবাবুকে তো চেনেন, হঠাৎ উদ্ভট খেয়াল হল, একটা বিদঘুটে মূর্তি করবেন। যেমন বলা, তেমনি কাজ। কাজ পেলে তো নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান। কাজও তত কম ঝামেলার নয়। অনেক রাসায়নিক কাণ্ডকারখানা করার পর তবে একটা মূর্তি দাঁড়ায়। আওয়াজ-টাওয়াজও হয় খুব। তাই নাকি সে রাত্রে বাইরের রাস্তায় কয়েকজন নানারকম আওয়াজ শুনেছে কারখানার মধ্যে। কয়েকবার পিস্তল ছোড়ার শব্দও শোনা গেছে। মজা দেখুন। আমি তো পরের দিন সকালে এসে জিনিসপত্র সব ছত্রাকার দেখলাম। গুছোতে কম ঝামেলা হয়েছে! সেই দিনই হঠাৎ খবর পেয়ে রওনা হলেন উনি।

'মূর্তিটা আমরা কোনও রকমে সেরে ফেললাম। কিন্তু বিপদ হল মিউজিয়ামে রাখা নিয়ে। যদিও বড়দের অংশেই রেখেছি, তবুও প্রথম দিনেই একজন ভদ্রমহিলা মূর্তির সামনে অজ্ঞান হলেন। দ্বিতীয় দিনে একজন মৃগীরুগির এমন

খিঁচুনি শুরু হল যে, শেষ পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হল আমাদের। তৃতীয় দিনে পুলিশ এসে হানা দিলে। দেখে-শুনে হুকুম দিল, এরকম বীভৎস জিনিস নাকি পাবলিকের সামনে রাখতে দেওয়া হবে না। কী অন্যায় বলুন তো? আর্ট ফর আর্টস সেক—সেখানেও মাতব্বরি। করঞ্জাক্ষবাবু ফিরে এলেই কোর্টের শরণাপন্ন হব।'

শান্তনু শুধু শুনছিল—কথা বলার শক্তি ছিল না। একবার ভাবল, না, আর না, এবার পালানো যাক। কিন্তু কিন্তনুলাল তাকে এমন সমাদর করে নিয়ে চলেছে নতুন মূর্তিটা দেখানোর জন্যে যে, এখন যাওয়ার প্রশ্নই তোলা যায় না।

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বোঝাচ্ছিল কিন্তনুলাল—'বাহাদুরি আছে বটে করঞ্জাক্ষবাবুর। কোন কী উপকথায় পড়েছেন যে, তিরিশ লক্ষ বছর আগে মেরুপ্রদেশে বরফের রাজ্যে ডেরা বেঁধেছিল ভিন গ্রহের কয়েকটি অতিকায় দানব। তার থেকেই এই কল্পনার সৃষ্টি। মূর্তিটার নাম দিয়েছি—"রান-টেগথ আর আত্মনিবেদন"।'

থরথর করে কেঁপে উঠল শান্তনু। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই কিন্তনুলালের। ওরা এসে দাঁড়াল পরদা দিয়ে ঘেরা রেলিং-এর বেড়া দেওয়া একটা কোণে। পরদা সরাবার দড়িতে হাত দিল উৎসাহী কিন্তনুলাল—শিউরে উঠলেও তাকে নিষেধ করার মতো কথা ফুটল না শান্তনুর কণ্ঠে।

ধীরে ধীরে সরে গেল পরদা।

আর, সজোরে রেলিং আঁকড়ে ধরলেও মাথা ঘুরে গেল শান্তনুর।

সাদা হাড়ের তৈরি আশ্চর্য কারুকাজ করা প্রকাণ্ড একটা সিংহাসন, ওপরে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে ওত পেতে বসে পুরো দশ ফুট উঁচু বিশাল এক অসম্ভব বিভীষিকা। ছ-টা কিলবিলে শুঁড়ের মাঝের দুটিতে ধরা একটা থেঁতলানো, চ্যাপটা, বিকৃত, রক্তশূন্য বস্তু। লক্ষ লক্ষ ছেঁদায় ঝাঁজরা জিনিসটার কয়েক জায়গা পুড়ে গেছে উগ্র আসিড জাতীয় পদার্থে। ভাঙাচোরা মাথাটা ঝুলছিল একদিকে—শুধু এই মাথা দেখেই বোঝা যায় যে, একসময়ে মানুষ বলেই পরিচিত ছিল এই লক্ষছিদ্রময় বস্তুটি।

ফোটো দেখেছে শান্তনু। ফোটোগ্রাফের মতোই হুবহু দেখতে সামনের ভয়াল দানবটি। কিন্তু তবুও সত্যিকারের মোমের দানবটির রক্ত হিম করা ভয়াবহতা

পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি ছবির মধ্যে। গোলাকার কবন্ধ দেহ—বুদ্‌বুদের মতো মাথা—মাছের চোখের মতো সাদা ড্যাবডেবে তিনটে চোখ—এক ফুট লম্বা শুঁড়—মাছের কানকোর মতো খাঁজকাটা প্রত্যঙ্গ—বিষাক্ত কেউটের মতো লক্ষ লক্ষ শোষণযন্ত্র—ছ-টা মোটা মোটা শুঁড়ের শেষে কাঁকড়ার মতো সুতীক্ষ্ণ দাঁড়াওয়ালা কালো থাবা। কালো থাবায় গাঁথা কাঁকড়ার মতো ধারালো দাঁড়াগুলো কিন্তু বড় চেনা, বড় পরিচিত!…

নিষ্ঠুর আনন্দে হাসছিল কিন্তনুলাল। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল শান্তনুর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল সে সামনের কদাকার কিন্তু ভয়ংকর দানবমূর্তিটার দিকে। কী ভীষণ কল্পনা, আর কী নিখুঁত রূপায়ণ! দিবানিশি এরই চিন্তায় বিকারে ভুগেছে করঞ্জাক্ষ। সে নিজেও রেহাই পায়নি। আর এখন আসল মূর্তিটার সামনে সে সম্মোহিতের মতো রইল দাঁড়িয়ে, ঝিমঝিম করতে লাগল সর্ব অঙ্গ—অথচ চোখ ফেরাতে পারল না সে, সরে যাওয়া তো দূরের কথা। উন্মাদ শিল্পী করঞ্জাক্ষের মতে নাকি এ বিভীষিকা কৃত্রিম নয়… কল্পনা নয়…

মানুষটার ভাঙাচোরা মোমের মাথাটা দুলছিল অল্প অল্প। অপলকে সেদিকে তাকিয়ে রইল শান্তনু। মাথাটা থেঁতলে গেলেও মুখটা চেনা যায়—অনেকটা করঞ্জাক্ষের মুখের মতো, সেইরকম পাগলাটে চাহনি তার ঠেলে বেরিয়ে আসা দুই চোখে। কিন্তু তাতে শিউরে ওঠার কী আছে? অহং ভাবে আচ্ছন্ন দক্ষ শিল্পী করঞ্জাক্ষের পক্ষে নিজের হুবহু প্রতিমূর্তি তৈরি করা এমন কিছুই কঠিন নয়। এ-ও এক ধরনের আত্মপ্রসাদ। কিন্তু তা তো নয়, শান্তনু শুধু এই দেখেই শিউরে উঠছে না। তার অবচেতন দৃষ্টি এমন কিছু দেখেছে, এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে ওই বিকৃত মুখের মধ্যে যে, অবদমিত আতঙ্কে শিউরে উঠলেও বুঝতে পারছে না কেন।

অসীম নৈপুণ্যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে গড়ে উঠেছে ভাঙাচোরা মাথাটা। হতভাগ্য কুকুরটার গায়ে হাজার হাজার ছিদ্রের অনুকরণে অগুনতি ক্ষত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুখে। কিন্তু এ ছাড়াও আরও আছে। বাঁ দিকের গালটা কীরকম যেন বেমানান ঠেকছে। প্রথম মডেলের একটা খুঁত শিল্পী কোনওরকমে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে—সৃষ্টি নিখুঁত হয়েও তাই যেন হয়নি। যতই দেখতে লাগল শান্তনু, ততই কুয়াশার মতো রহস্যময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার চেতনার দিগ্‌দিগন্তে। আর তারপরেই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে পড়ে গেল সেই ভয়ংকর

রাতের দৃশ্য। ধস্তাধস্তির পর হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে উন্মাদ করঞ্জাক্ষকে সে ফেলে রেখেছিল কারখানাঘরের মেঝেতে।

আর, তার বাঁ দিকের গাল বরাবর এক বিঘত লম্বা ক্ষত থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরছিল রক্তের ধারা…

রেলিং-এর ওপর থেকে শান্তনুর শক্ত মুঠি শিথিল হয়ে গেল—জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

কিন্তু তখনও হাসতে লাগল কিন্তনুলাল।…

কল্পবিশ্ব সম্পাদকঃ গল্পটি এইচ পি ল্যাভক্রাফট ও হাজেল হেল্ড এর লেখা 'দ্য হরর ইন দ্য মিউজিয়াম' এর ভাবানুবাদ। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফ্যান্টাসটিক পত্রিকায় ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে। লেখকের অনুমতি নিয়ে গল্পটি কল্পবিশ্বে পুনঃপ্রকাশিত হল। গল্পটি ওসিয়ার করে সাহায্য করেছেন সুদীপ দেব।